শঙ্কুর পরলোকচর্চা

সেপ্টেম্বর ১২

আজ বড় আনন্দের দিন। দেড় বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আজ আমাদের যন্ত্র তৈরির কাজ শেষ হল। 'আমাদের' বলছি এই কারণে যে, যদিও যন্ত্রের পরিকল্পনাটা আমার, এটা তৈরি করা আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। গিরিডিতে আমার ল্যাবরেটরিতেও এই যন্ত্র তৈরি করার উপযুক্ত মালমশলা নেই। এ ব্যাপারে আমি প্রথমেই চিঠি লিখি আমার জার্মান বন্ধু উইল্‌হেল্‌ম ক্রোলকে। জার্মানির ম্যুনিখ শহরে একটি বিখ্যাত পরলোকতত্ত্ব অনুশীলন সংস্থা বা সাইকিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে। ক্রোলেরই সুপারিশে এই সংস্থা থেকে আমরা অর্থসাহায্য পেয়েছি, এবং এই টাকাতেই দুই জার্মান ও এক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মিলে সম্ভব হয়েছে এই যন্ত্রটি তৈরি করা। দ্বিতীয় জার্মানটি হলেন এক যুবক—নাম রুডল্‌ফ হাইনে। প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে এই যুবকেরও অপরিসীম উৎসাহ।

যন্ত্রটি সম্বন্ধে এবার কিছু বলি। এর নাম আমরা দিয়েছি কম্পিউডিয়াম। অর্থাৎ কম্পিউটারাইজ্‌ড মিডিয়াম। যারা প্ল্যানচেটের সাহায্যে পরলোকগত আত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে, তারা অনেক সময়ই একজন মিডিয়ামের সাহায্য নেয়। এই মিডিয়াম হলেন এমন একজন ব্যক্তি, যার মাধ্যমে প্রেতাত্মা সহজেই আবির্ভূত হয়। মিডিয়ামের এই হল বিশেষ গুণ। আমি দেশে অনেক মিডিয়ামের সংস্পর্শে এসেছি, এবং এদের স্টাডি করেছি। এদের স্বভাব হয় একটু বিশেষ ধরনের। অনুভূতি রীতিমতো সূক্ষ্ম, আর তার সঙ্গে একটু ভাবুক, তদ্‌গত ভাব। স্বাস্থ্য অনেকেরই দুর্বল, আয়ুও অনেক ক্ষেত্রেই কম। আমাদের যন্ত্রটা তৈরি করার আগে ইউরোপে ক্রোল আর ভারতবর্ষে আমি অন্তত সাড়ে তিনশো মিডিয়ামকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখি। আমাদের উদ্দেশ্যই ছিল আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপনের কাজে জ্যান্ত মিডিয়ামের জায়গায় যান্ত্রিক মিডিয়াম ব্যবহার করা। এই কাজে ম্যুনিখের সাইকিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আমাদের প্রস্তাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতে এককথায় রাজি হয়ে যায়। টাকাও তারা ঢেলেছে অঢেল। এরমধ্যেই কম্পিউডিয়ামের ক্ষমতার যা পরিচয় পেয়েছি তাতে আমাদের তিনজনের পরিশ্রম আর ইনস্টিটিউটের অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়।

যন্তরটা দেখতে মানুষের মতো হবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমরা ইচ্ছা করেই এটার একটা ধড় এবং মুণ্ডু দিয়ে দিয়েছি। সেইসঙ্গে দাঁড় করাবার জন্য পায়েরও ব্যবস্থা হয়েছে। যন্ত্রটা ঠিক এক মিটার উঁচু। মাথার উপর একটা চেরা ফাঁক রয়েছে, সেখান দিয়ে আমরা যে আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন করতে চাইছি তার সম্বন্ধে তথ্য একটা কার্ডে লিখে পুরে দেওয়া হয়। যন্ত্রটাকে ঘরের এক পাশে বসিয়ে রেখে যারা এই প্ল্যানচেটে অংশ নিচ্ছে, তাদের বসানো হবে হাতদশেক দূরে এটার মুখোমুখি। যন্ত্রে কার্ড পোরা হলে পর ঘরের বাতি নিবিয়ে দেওয়া হয়। এই সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে ক্রমে যন্ত্রের বুকে বসানো একটা লাল বাতি জ্বলে ওঠে। তার মানে আত্মা উপস্থিত। এইবার আমরা আত্মাকে প্রশ্ন করতে থাকি, আর তার উত্তর যন্ত্রের মুখ দিয়ে বেরোতে থাকে। আত্মা ক্লান্ত হলে পর লাল বাতিটা ধীরে ধীরে নিবে যায়, আর প্ল্যানচেটও শেষ হয়ে যায়।

আমরা তিন বৈজ্ঞানিক মিলে যন্ত্রটাকে এরমধ্যেই পরীক্ষা করে দেখেছি। অ্যাডল্‌ফ হিটলারের

আত্মাকে আনানো হয়েছিল। তথ্য যন্ত্রে পুরে দেওয়ার এক মিনিটের মধ্যেই লাল বাতি জ্বলে ওঠে। আমি জার্মান ভাষায় প্রশ্ন করি, 'তুমি কি অ্যাডল্‌ফ হিটলার?' উত্তর আসে 'ইয়া', অর্থাৎ হ্যাঁ। ক্রোল দ্বিতীয় প্রশ্ন করে, 'তুমি ইহুদিদের এমন নৃশংসভাবে নির্যাতন করেছ তোমার জীবদ্দশায়, তার জন্য এখন তোমার অনুশোচনা হয় না?' তৎক্ষণাৎ যন্ত্রের মুখ থেকে তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর বেরোয়—'নাইন! নাইন! নাইন!'—অর্থাৎ না, না, না। প্রায় পাঁচ মিনিট চলেছিল এই আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার; এটা বেশ বুঝেছিলাম যে, হিটলার বেঁচে থাকতে সে নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করত, মৃত্যুর এতদিন পরেও তার কোনও পরিবর্তন হয়নি।

দু'দিন বিশ্রাম নিয়ে আবার যন্ত্রটাকে নিয়ে কাজ শুরু করব। হাইনের আকাঙ্ক্ষা একেবারে আকাশচুম্বী। সে মনে করে যে, যন্ত্রের আরেকটু সংস্কার করলে আমরা আত্মার চেহারা দেখতে পাব। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি সশরীরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে।

সেটা হলে মন্দ হয় না, কিন্তু এখনও যন্ত্রটা যে অবস্থায় রয়েছে এবং যে কাজ করছে, সেটাকেও বিজ্ঞানের একটা অক্ষয় কীর্তি বললে বাড়িয়ে বলা হবে না।

এবার একদিন কিছু বাছাই করা বৈজ্ঞানিকদের ডেকে আমাদের যন্ত্রের একটা ডিমনস্ট্রেশন দিতে হবে। এখনও পর্যন্ত ব্যাপারটা ধামাচাপা রয়েছে।

আমি ক্রোলের অনুরোধে আরও একমাস ম্যুনিখে থাকব।

সেপ্টেম্বর ১৫

আমাদের যন্ত্রের সাহায্যে দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন করেছি। একটি ভারতীয়—নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলা। এটা আমার একটা ব্যক্তিগত কৌতূহল মেটানোর জন্য। সিরাজকে জিজ্ঞেস করলাম অন্ধকূপ হত্যার কথা। সিরাজ হেসে বলল, সে এ সম্বন্ধে কিছুই জানত না। ব্রিটিশরা তাকে হেয় করার জন্য এই জঘন্য অপবাদ রটিয়েছিল। আত্মা মিথ্যা বলে না, তাই কলঙ্কমোচনটা বেশ ভালভাবেই হল।

দ্বিতীয় আত্মাটি ছিল শেক্‌সপিয়রের। এখানে আমার প্রশ্ন ছিল, 'তোমার সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন যে, তুমি যা লেখাপড়া শিখেছিলে এবং যে সাধারণ পরিবারে তোমার জন্ম, তাতে করে মনে হয় না যে, তোমার নাটক আর কাব্য তুমি নিজেই লিখেছ। অনেকের ধারণা লেখক আসলে হলেন ফ্রান্সিস বেকন। এ বিষয়ে তুমি কী বলো?'

শেক্‌সপিয়রের আত্মা প্রশ্ন শুনে প্রথমে অট্টহাস্য করে ওঠে। তারপর মানুষের অপজ্ঞান সম্বন্ধে একটা চমৎকার চার লাইনের পদ্য শুনিয়ে প্রশ্ন করল, 'আমার ভাষায় বেকন মানে কী জান?' আমি বললাম, 'কী?' উত্তর এল, 'বেকন মানে গেঁয়ো ভূত। তোমাদের অভিধান খুলে দেখো—এই মানে দেওয়া আছে। এই গেঁয়ো ভূত রচনা করবে আমার নাটক? তোমাদের যুগের মানুষের কি মতিভ্রম হয়েছে?'

এই দুটি আত্মা নামানোর সময়ও কেবল আমরা তিনজনই উপস্থিত ছিলাম। গতকাল সন্ধ্যায় এখানকার এগারো জন বৈজ্ঞানিককে ডেকে আমাদের যন্ত্রের একটা ডিমনস্ট্রেশন দেওয়া হল। ক্রোল আমাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিল যে, এঁদের মধ্যে দু'একজন আছেন যাঁরা প্ল্যানচেটে আদৌ বিশ্বাস করেন না। বিশেষ করে প্রোফেসর শুল্‌ৎস। লোক হিসেবেও নাকি ইনি বিশেষ সুবিধের নন, যদিও একটি পদার্থবিজ্ঞান সংস্থার শীর্ষে বসে আছেন। তিন বছর আগে এই সংস্থার ডিরেক্টর প্রোফেসর হুবারমানের অকস্মাৎ মৃত্যুতে শুল্‌ৎস এই পদটি পান।

আমি বললাম, 'কিছু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক থাকবেই, যাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করা কঠিন হবে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। শুল্‌ৎস যা-ই বলুন না কেন, আমরা আমাদের ডিমনস্ট্রেশন

চালিয়ে যাব।'

হাইনে বলল, 'এঁদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করার সবচেয়ে ভাল উপায় হবে হুবারমানের আত্মাকে আহ্বান করা। তাঁর কথা বলার ভঙ্গি এঁদের সকলেরই জানা আছে। আমাদের যন্ত্র যদি সেইভাবে কথা বলে, তাহলে এঁদের মনে সহজেই বিশ্বাস আসবে।'

আমি আর ক্রোল এ প্রস্তাবে সায় দিলাম।

সাইকিক ইনস্টিটিউটের একটি হলঘরেই সব ব্যবস্থা হল। সন্ধ্যা সাতটায় সময় দেওয়া হয়েছিল, সকলেই ঘড়ির কাঁটায় এসে হাজির।'

সামনের সারিতে একটি চেয়ার দখল করে বসবার আগেই শুলৎস বলল, 'আমি আগে একবার যন্ত্রটাকে দেখতে চাই।'

ক্রোল বলল, 'স্বচ্ছন্দে।'

শুল্‌ৎস প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যন্ত্রটাকে দেখল। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসে বলল, 'ঠিক আছে; এবার শুরু হোক তোমাদের তামাশা।'

এবার ক্রোল ঘোষণা করল যে, প্রথমে প্রোফেসর হুবারমানের আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন করা হবে। আমি ভেবেছিলাম, শুল্‌ৎস হয়তো আপত্তি করবে, কিন্তু সে কিছুই বলল না। অন্য সকলে অবশ্যই রাজি।

যন্ত্রের মধ্যে তথ্য পুরে দিয়ে ক্রোল ঘরের বাতি নিভিয়ে সন্তর্পণে এসে আমার পাশে নিজের চেয়ারে বসল।

সবাই তটস্থ, ঘরে চোদ্দোজন বৈজ্ঞানিকের নিশ্বাস ফেলার শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

priyobanglaboi.blogspot.com

দু' মিনিটের মাথায় ধীরে ধীরে লাল বাতিটা জ্বলে উঠল। বাতিটা থেকে খানিকটা প্রতিফলিত আলো ঘরের মানুষদের উপরেও এসে পড়েছিল, তাই আবছা আবছা সকলকেই চেনা যাচ্ছিল। অবিশ্যি যন্ত্রের পিছন দিকটায় দুর্ভেদ্য অন্ধকার।

'আপনি কি প্রোফেসর হুবারমান?' প্রশ্ন করল ক্রোল।

উত্তর এল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে ডাকা হয়েছে কেন? এই মিথ্যার জগৎ আমার কাছে একেবারে মূল্যহীন।'

'একথা কেন বলছেন?' ক্রোল প্রশ্ন করল।

উত্তর এল, 'যে জগতে নৃশংস হত্যাকারীও আইনের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যায়, তার কী মূল্য থাকতে পারে?'

আমি অন্যদের দিকে চেয়ে দেখলাম, তাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের ভাব। শুল্‌ৎস চেঁচিয়ে উঠল, 'এসব বুজরুকির অর্থ কী? ক্রোল, আমার বিশ্বাস, তুমি হুবারমানের হয়ে কথা বলছ। তুমি তো ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম জান!'

ক্রোল যে ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম জানে, সেটা আমিও জানতাম, কিন্তু এ গলা যে আমাদের যন্ত্র থেকেই আসছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ক্রোলের মুখ বন্ধ; সে অবস্থায় শব্দ উচ্চারণ করা মোটেই সম্ভব নয়।

এদিকে যন্ত্রের মধ্যে থেকে আবার কথা শুরু হয়ে গেছে।

'আমি ছিলাম পদার্থবিজ্ঞান সংস্থার ডিরেক্টর। আমার পদটি দখল করার জন্য আমার কফির সঙ্গে পটাশিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে আমাকে খুন করেন ইয়োহান শুল্‌ৎস। কিন্তু শুধু প্রমাণের অভাবে তিনি পার পেয়ে যান। এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কিছু থাকতে পারে না। আমি...'

হঠাৎ একটা কাচ ভাঙার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে লাল বাতি উধাও হয়ে গেল। আমার দৃষ্টি প্রোফেসর শুল্‌ৎসের উপর ছিল, তাই আমি দেখলাম যে, সে পকেট থেকে তার পাইপটা বার করে যন্ত্রের দিকে ছুড়ছে, আর অব্যর্থ লক্ষ্যে বাল্‌বটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

সেইসঙ্গে অবিশ্যি আত্মার কথাও বন্ধ হয়ে গেল।

ক্রোল উঠে গিয়ে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিল।

আমাদের সকলেরই দৃষ্টি শুল্‌ৎসের দিকে। কিন্তু শুল্‌ৎসের স্নায়ু যে অত্যন্ত মজবুত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে শুধু ইস্পাতশীতল কণ্ঠে ক্রোলকে উদ্দেশ করে বলল, 'আজকের এই ঘটনার ফলে আমি কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আনতে পারি। যন্ত্রের দোহাই দিয়ে তুমি আমাকে হত্যাকারী বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছ? তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়!'

এই কথা বলে শুল্‌ৎস তার পাইপটা না নিয়েই গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাকি দশজনের মধ্যে একজন—পদার্থবিদ প্রোফেসর এরলিখ—শুধু একটি মন্তব্য করলেন তাঁর গম্ভীর গলায়।

'আমাদের অনেকেরই মনের সন্দেহ আজ সত্যি বলে প্রমাণ করেছেন হুবারমানের আত্মা। এই যন্ত্রের কোনও তুলনা নেই।'

সেপ্টেম্বর ১৮

এই একদিনের ঘটনার ফলেই আমাদের কম্পিউডিয়ামের খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের আরেকটা ডিমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। ইতিমধ্যে বাল্‌বটা আমরা নতুন করে লাগিয়ে নিয়েছি। আমাদের তরুণ বন্ধু হাইনে যন্ত্রটার পিছনে অনেকটা করে সময় দিচ্ছে, যাতে ওর আরও কিছু ক্ষমতা আরোপ করা যায়। আগামী শনিবার ২২ সেপ্টেম্বর প্রায় পঞ্চাশজন গণ্যমান্য

priyobanglaboi.blogspot.com

ব্যক্তিকে বলা হয়েছে কম্পিউডিয়ামের একটা ডিমনস্ট্রেশনের জন্য। ইনস্টিটিউটেই হবে ব্যাপারটা। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, ডাক্তার, সংগীতশিল্পী, চিত্রকর, ব্যবসাদার, সাংবাদিক—সব রকমই লোক আছে। দেখা যাক কী হয়।

সেপ্টেম্বর ২৩

কাল হইহই কাণ্ড। কিন্তু সাংবাদিকদের নিয়ে কী করা যায় সেটা ভেবে পাচ্ছি না। এত প্রমাণের পরেও তারা বলছে, ব্যাপারটাতে বুজরুকি আছে। অন্ধকারের মধ্যে আমরা নাকি নিজেরাই যা করার করে যন্ত্রের উপর দায়িত্ব চাপাচ্ছি। 'তিন বৈজ্ঞানিকের কারচুপি', 'বিজ্ঞানের মুখে কালি' ইত্যাদি হেডলাইন কাগজে বেরিয়েছে। হাইনে বারবার বলছে, 'আত্মাকে চোখের সামনে উপস্থিত করতে পারলে তবেই এরা ব্যাপারটা বিশ্বাস করবে।' আমরা ওকে এক মাস সময় দিয়েছি যন্ত্রটার উপর কাজ চালাতে। তাতে ও যদি সফল হয় তাহলে তো কথাই নেই।

এবার ২২ তারিখের বৈঠকে কী হল সেটা বলি।

তবে তারও আগে একটা কথা বলা দরকার।

আমি কিছুদিন থেকেই ভাবছিলাম যে, ঐতিহাসিক যুগে সভ্য জগৎ থেকে আত্মা নামানো তো হল; এবার আরেকটু পিছনে গেলে কেমন হয়। সম্প্রতি এখানকার খবরের কাগজে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে, সেইটে পড়েই এই চিন্তাটা প্রথম মাথায় আসে। বাউমগার্টেন বলে একজন ইতিহাসের অধ্যাপক প্রস্তরযুগের মানুষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন যে, স্পেন ও ফ্রান্সের কিছু গুহায় যেসব জানোয়ারের আশ্চর্য রঙিন ছবি রয়েছে—তেমন আঁকা আজকের দিনের শিল্পীর পক্ষেও প্রায় অসম্ভব—সেগুলো প্রস্তরযুগের মানুষের কীর্তি হতেই পারে না। লেখাটা পড়ে আমার মনে পড়ল যে, গুহাগুলো যখন আবিষ্কার হয়েছিল, তখনও সভ্য সমাজের অনেকেই এই একই কথা বলে যে,

ছবিগুলো আসলে আজকের দিনের কোনও শিল্পীর আঁকা, সেগুলোকে বিশ হাজার বছরের পুরনো বলে চালানো হচ্ছে।

আমি ঠিক করলাম, এবার কম্পিউডিয়ামের সাহায্যে সেই প্রস্তরযুগের একজন মানুষের আত্মাকে আনাব। তার সঙ্গে অবিশ্যি কথা বলা চলবে না। কারণ সম্ভবত অতদিন আগে কোনও ভাষার উদ্ভব হয়নি। কিন্তু এই আত্মা কী রকম আচরণ করে, মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করে কি না, সেগুলোও তো জানবার জিনিস। হয়তো সে একটা অজানা কোনও ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করবে। সেটা অবশ্যই একটা অতি মূল্যবান আবিষ্কার হবে।

ক্রোল শুনে আমার প্রস্তাবে সায় দিয়ে বলল, 'তাহলে প্রবন্ধের লেখক বাউমগার্টেনকেও ডাকা যাক—সেও উপস্থিত থাকুক।'

আমি বললাম, 'উত্তম প্রস্তাব।'

বাউমগার্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখলাম, সে যে শুধু প্রস্তরযুগের প্রাচীর-চিত্রকেই উড়িয়ে দেয় তা নয়, পরলোকচর্চা সম্পর্কেও তার প্রচণ্ড অবিশ্বাস। দস্তুরমতো সাধাসাধি করে তবে তাকে শেষপর্যন্ত রাজি করানো গেল।

বাইশে সন্ধ্যা সাতটায় সকলে হাজির হল ইনস্টিটিউটের মাঝারি হলটায়। একটা জানলাহীন বড় দেয়ালের সামনে কিছু দূরে যন্ত্রটাকে রাখা হল, আমরা এবং আমন্ত্রিত সকলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে তার সামনে পনেরো হাত দূরে চেয়ার পেতে বসলাম। সভা শুরু হবার আগে আমি উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলাম যে, আজ আমরা প্রস্তরযুগের একজন মানুষের আত্মাকে আহ্বান করছি। যদি দেখি, তাতে কোনও ফল হল না, তাহলে ঐতিহাসিক যুগের কাউকে ডাকব।

এবার আমি যন্ত্রের মাথায় তথ্যের কার্ড গুঁজে দিয়ে বোতাম টিপে দিলাম। বলা বাহুল্য, যন্ত্রটা বৈদ্যুতিক শক্তিতে কাজ করে।

এরপর ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে কী ঘটে দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

তিন মিনিট পেরিয়ে গেল, বাতি আর জ্বলে না। তা হলে কি...?

না—ওই যে ক্ষীণ আলো দেখা দিয়েছে।

ক্রমে লাল বাতি উজ্জ্বলতর হল। তারপর একটা সময় এসে স্থির হয়ে গেল।

কোনও শব্দ নেই। কিন্তু ঘরে একটা বুনো গন্ধ পাচ্ছি। এটা বোধ হয় হাইনের কারসাজি, কারণ গন্ধ এতদিন পাইনি।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করে আমি স্পেনীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম, 'এ ঘরে কোনও আত্মা এসেছে কি?'

উত্তরের বদলে একটা যেন ঘড়ঘড়ে জান্তব শব্দ হল। তারপর আরও কয়েকটা শব্দ হল, যার কোনও মানে আমাদের জানা নেই।

বুঝলাম, এই আত্মার সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ নেই।

কিন্তু তা হলে কী করা হবে? লাল আলো দেখে বুঝতে পারছি, আত্মা এখনও উপস্থিত।

প্রায় মিনিটদশেক এইভাবে জ্বলে আলোটা ক্রমে মিলিয়ে গেল।

আর তার পরেই ঘরের বাতি জ্বলতে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখে আমাদের সকলের মুখ থেকেই নানারকম বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল।

যন্ত্রের পিছনের সাদা দেয়ালে একটা শিং বাগিয়ে তেড়ে আসা বাইসনের প্রকাণ্ড রঙিন ছবি আঁকা রয়েছে। এ ছবি যদি পিকাসোও আঁকতেন, তা হলেও তিনি গর্বই বোধ করতেন।

এই ছবি আমাদের জন্য এঁকে গেছেন বিশ হাজার বছর আগের প্রস্তরযুগের অজ্ঞাত মানুষের আত্মা।

priyoboi.blogspot.com

সেপ্টেম্বর ২৮

সেদিনের আশ্চর্য ঘটনা সম্পর্কে আমাদের একজন দর্শক—পুরাতত্ত্ববিদ প্রোফেসর ওয়াইগেল—যন্ত্রটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সংবাদপত্রে একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে বাউমগার্টেন আবার আমাদের বুজরুক বলে ঘোষণা করেছেন অন্য আর একটা কাগজে। আমাদের তিনজনের মধ্যে নাকি একজন শিল্পী, আর তিনিই নাকি অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দেয়ালে ছবি এঁকে এসেছিলেন। এর ফলে গত তিনদিন ধরে কাগজে তুমুল তর্কবিতর্ক চলছে। বেশিরভাগ কাগজই আমাদের বিরুদ্ধে। আমি সাংবাদিক জাতটার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সব ছেড়েছুড়ে দেশে ফেরার কথা ভাবছি। এমন সময় আজ সকালে হঠাৎ হাইনে এসে সোল্লাসে ঘোষণা করল যে, তার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে, যন্ত্রের পাশে আত্মা সশরীরে আবির্ভূত হচ্ছে। আমি তো অবাক। ক্রোলকে বলতে সে বলল, 'অবিলম্বে পরীক্ষা করে দেখা যাক। তুমি নিজে কি পরীক্ষা করেছ?'

'না করে আর বলছি!' বলল হাইনে। 'আমি আমারই নামধারী অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হাইনরিখ হাইনের সঙ্গে এইমাত্র কথা বলে আসছি। তিনি কী পোশাক পরেছিলেন, তারও বর্ণনা আমি দিতে পারি।'

আমরা তিনজনে তখনই যন্ত্রটাকে নিয়ে বসে গেলাম। দশ মিনিটের মধ্যে দেখি বিশ্ববিখ্যাত জার্মান সুরকার বেটোফেন কালো কোট পরে আমাদের সামনে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। আমরা তাঁকে কিছু প্রশ্ন করার আগেই বেটোফেন গভীর আক্ষেপের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'উঃ—

আমার এই বধিরতাই হবে আমার কাল! হে ভগবান, আমারই কানদুটোকে শেষটায় তুমি নিষ্ক্রিয় করে দিলে!'

মনে পড়ে গেল, বেটোফেন মাঝবয়স থেকেই কালা হয়ে গিয়েছিলেন।

হাইনের এই কীর্তিতে আমরা বাকি দুজনও খুব গর্ব বোধ করছি। আমার মন বলছে, এবার হয়তো সাংবাদিকদের স্থূল মস্তিষ্কে প্রবেশ করানো যাবে আমাদের এই যন্ত্রের অনন্যতা।

আমরা তিনজনেই স্থির করলাম যে, ইনস্টিটিউটের সাহায্যে জার্মানির যত নামকরা সাংবাদিক আছে—বিশেষ করে যারা আমাদের নিন্দা করেছে—তাদের সকলকে আরেকটা বৈঠকে ডাকব। এবার ইনস্টিটিউটের বড় লেকচার-হলটাকে নেওয়া হবে এবং মঞ্চের মাঝখানে বসবে আমাদের যন্ত্র।

আমরা সেই মর্মে আমন্ত্রণ পাঠিয়ে দিয়েছি। অবিশ্যি এবারও আমরা বৈজ্ঞানিকদের বাদ দিইনি। শুল্‌ৎসকেও বলা হয়েছে। সে কার্ড পেয়ে আমাকে ফোন করেছিল। বলল, 'এবার কী নতুন বুজরুকি দেখাবে তোমরা?'

আমি বললাম, 'সেটা আপনি সশরীরে বর্তমান থেকে দেখুন না। এইটুকু বলতে পারি যে, এবার শুধু শোনার নয়, দেখার জিনিসও থাকবে।'

শুল্‌ৎস হেসে বলল, 'তা ম্যাজিক দেখতে আর কে না ভালবাসে! আর সে ম্যাজিক যদি সর্বসমক্ষে ফাঁস করে দেওয়া যায়, তার থেকে বেশি মজা আর কিছুতেই নেই।'

আমি বললাম, 'আপনার মতলব তাই হলেও আপনি দয়া করে আসুন।'

'দেখি', বলল শুল্‌ৎস।

BanglaBook.org

আমার মন বলছে, শুল্‌ৎস না এসে পারবে না।

সবসুদ্ধ সাড়ে সাতশো লোককে বলা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের হলে ধরে আটশো।

৩ অক্টোবর আমাদের বৈঠক।

অক্টোবর ৩, রাত সাড়ে বারোটা

আজ সন্ধ্যার ঘটনা ভাবতে এখনও শিউরে শিউরে উঠছি। তবে আমাদের যে জয় হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বৈঠকের শেষে শিহরন সত্ত্বেও হলের কোনও লোক হাততালি দিতে ছাড়েনি। আমাদের তৈরি এই কম্পিউটিডিয়াম আমাদের মান রেখেছে আশ্চর্যভাবে।

আমন্ত্রিতদের প্রত্যেকেই এসেছিল। বিনাপয়সায় তামাশা দেখার লোভ কে সামলাতে পারে? শেষপর্যন্ত টেলিফোনে বহু অনুরোধের ফলে লেকচার-হল ভরেই গেল।

আজ সভা আরম্ভ হবার আগে একটা ছোট বক্তৃতায় ক্রোল জানিয়ে দিল আমাদের মনোভাবটা। বিজ্ঞানের কোনও যুগান্তকারী আবিষ্কারই প্রথমে সকলে মেনে নেয়নি। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, টেলিভিশন থেকে শুরু করে আণবিক বিস্ফোরণ, চাঁদে অবতরণ, মহাকাশে স্যাটিলাইট প্রেরণ, এই সবকিছু সম্বন্ধেই বহু লোকে মনে সন্দেহ পোষণ করেছে। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হবে, এবং আজকে যা ঘটতে চলেছে, তা এই যন্ত্র সম্পর্কে মানুষের মনে বিশ্বাস জাগাবে, এটাই আমাদের ধারণা।

আজ কথা ছিল যে, যন্ত্রটার মাথায় তথ্য পুরবে হাইনে, এবং সে যে কার প্রেতাত্মাকে নামাতে চায়, সেটা আমাদের দু'জনকেও বলবে না। এটা হবে একটা সারপ্রাইজ। ক্রোল আমি তাতে রাজি হয়ে যাই, কারণ, হাইনের বয়স কম হলেও সে অতি বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক। তা ছাড়া, তার তরুণ মস্তিষ্কে যে ধরনের বুদ্ধি খেলে, সেটা বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজে লাগতে পারে।

ক্রোল বক্তৃতা দিয়ে বসার পর হাইনে উঠে দাঁড়িয়ে সভার সকলকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'আজ আমরা আপনাদের জানিয়েছি যে, আমাদের কম্পিউটিডিয়ামের সাহায্যে একটি প্রেতাত্মা উপস্থিত করা হবে। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, সেটা কীসের আত্মা সেটা আগে থেকে বলা হবে না। আত্মা এলে পর আপনারা নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।'

হাইনে তার কথা শেষ করে পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে মঞ্চের মাঝখানে রাখা যন্ত্রটার মাথায় গুঁজে দিল। তারপর একজন কর্মচারীর দিকে ইঙ্গিত করাতে সে হলের সব বাতি নিবিয়ে দিল।

আমি সহজে নার্ভাস বা বিচলিত হই না। কিন্তু আজ কেন জানি আমি বুকের ভিতর একটা দুরুদুরু অনুভব করছিলাম। কার আত্মা আসছে হাইনের আহ্বানে?

পাঁচ মিনিট কোনও ঘটনা নেই। ঘরে মিশকালো অন্ধকার। জানালাগুলো কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা। কে যেন একজন কাশতে গিয়ে কাশি চেপে নিল। তারপরেই আবার নিস্তব্ধতা। বুঝতে পারছি, সকলে দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে।

আমার দৃষ্টি মঞ্চের মাঝখান থেকে এক চুলও নড়ছে না।

ওই যে—একটা যেন লাল বিন্দু দেখতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ, কোনও ভুল নেই। যন্ত্রের বুকে লাল আলো জ্বলে উঠেছে। তার মানে...

হঠাৎ একটা শব্দ পেলাম নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে।

ঝড়ের শব্দ।

না, ঝড় নয়; উড়ন্ত পাখির ডানার শব্দ।

ওই যে পাখি। পাখি কি? হলের এ মাথা থেকে ও মাথা উড়ে বেড়াচ্ছে ওটা কী?

এবার বুঝতে পারলাম—কারণ প্রাণীটার গা থেকে ফসফরাসের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বাদুড় পাখি আর সরীসৃপ মেশানো একটা প্রাণী, মঞ্চের মাঝখান থেকে উঠে চক্রাকারে ঘুরতে লেগেছে সমস্ত হল জুড়ে, দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে। সেইসঙ্গে মাঝে মাঝে তার দাঁতালো মুখটা হাঁ করে চিৎকার করে উঠছে।

টেরোড্যাকটিল!

দাঁত ও ডানা বিশিষ্ট ভীষণ হিংস্র প্রাণী—আজ থেকে দেড় কোটি বছর আগে ছিল পৃথিবীতে। হাইনে সেই প্রাণীর বর্ণনা দিয়েছে তার কার্ডে। প্রাণীর চোখদুটো জ্বলজ্বলে সবুজ, দেখলেই মনে হয় যেন হিংস্রতার প্রতীক। তার উপরে তার শরীর থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি তাকে আরও ভয়ানক করে তুলেছে।

হলে তুমুল চাঞ্চল্য, আর সেটা যে চরম আতঙ্কের অভিব্যক্তি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সব গোলমাল ছাপিয়ে হাইনে চেঁচিয়ে উঠল মাইকে—'এইবার বিশ্বাস হয়েছে তো?'

সমস্বরে উত্তর এল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ! এই জীবকে সরাও, অবিলম্বে সরাও।'

হাইনেই বোধ হয় যন্ত্রের সুইচটা বন্ধ করে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের বাতি জ্বলে উঠল।

• দর্শকদের মধ্যে সাতজন লোক ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সামনের সারির একজন কালো সুট পরা ভদ্রলোক চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে গেছেন।

কাছে গিয়ে দেখলাম, লোকটি প্রোফেসর শুল্‌ৎস।

ক্রোল শুল্‌ৎসের কবজি ধরে নাড়ি দেখে গম্ভীরভাবে বলল, 'ইনি আর বেঁচে নেই।'

এদিকে এই মৃত্যুর পশ্চাৎপটে চলেছে তুমুল করধ্বনি।

মনে মনে বললাম, 'কম্পিউডিয়ামের জয়, বিজ্ঞানের জয়।'

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৯৪

priyobanglaboi.blogspot.com